গবাদি - ১

একথা অনেককে বলতে শুনেছি যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা - অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরাও - তাদের বাপ-ঠাকুর্দা মা-দিদিমারা যখন তাদের বয়সী ছিলেন সেই তুলনায় ঢের বেশী জানে, বোঝে, ঢের বেশী 'ম্যাচিওর' অর্থাৎ পরিপক্ক। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস আগেকার বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা তাদের দৈনন্দিন জীবনেই এত সব বৈচিত্রময় ঘটনা ও পরিবেশের সম্মুখীন হ'ত যে জীবনের পাঠগুলো নিজে নিজেই রপ্ত হয়ে যেতো তাদের। তারা বড় হয়ে স্ব স্ব কর্মজীবন ও গার্হস্থ্য জীবনে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রবেশ করতো। আমার মত যারা ক্ষুদ্র 'নিউক্লিয়ার' পরিবারে বড় হয়েছে তারা এই সুযোগ সুবিধা পায়নি।

স্কুল-কলেজে আমার সমাধ্যায়ীরা সকলেই কৃপার চোখে দেখতো আমায়। আড়ালে বলতো গবেট (নিজের কানে না শুনলেও ওরা যে তা বলতো সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত), সামনে বলতো "নাইভ" অর্থাৎ হাস্যকর ভাবে সরল। নাইভ শব্দটা আমার শব্দকোষে সবচেয়ে অপছন্দের। সারা জীবন শুনে শুনে অ্যালার্জির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

অক্সফোর্ডে লেকফোর্ড রোডের ডিগ্‌সে থাকা কালে দিল্লীর মিরান্ডা কলেজের অধ্যাপিকা রমা মিত্র আমার পাশের ঘরে থাকতেন। বয়সে আমার চাইতে বেশ কিছু বড় ছিলেন। নানা ব্যাপারে আমার অজ্ঞতা বোধহয় পীড়াদায়ক মনে হত তাঁর। প্রায়ই উক্ত বিশেষণে ভূষিত করতেন আমায়। নাইভ আখ্যা দ্বারা উনি ঠিক কি বোঝাতে চান তা স্পষ্ট করার জন্যে একটা গল্প বলেছিলেন। গল্পই নিশ্চয়, সত্যি সত্যি এত নাইভ কি আর হতে পারে কেউ?

গল্পটা এই রকম। এক অসুস্থ মহিলা ডাক্তারের কাছে গেছে। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললো কোন অসুখ বিসুখ নয়, মহিলা সন্তান সম্ভবা। রোগের নিদান শুনে রুগী মূর্ছা যায় আর কি! বললো প্রশ্নই ওঠে না। সুদূরতম সম্ভাবনা নেই এহেন উদ্ভট অঘটনের। শেষে গত ক'মাসের সকল ঘটনাবলি সঙ্গীসাথীদের সাথে বসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমীক্ষা করতে গিয়ে মহিলার মনে পড়লো কিছুদিন

আগে তার একটা ছোটখাটো পথদুর্ঘটনা হয়েছিল। তেমন কিছু চোট লাগেনি কিন্তু অপরাধী গাড়ির সদাশয় চালক ফার্ষ্ট-এড না দিয়ে ছাড়লো না। সেই ফার্ষ্ট-এড'ই বর্তমান বিপত্তির কারণ।

আমাদের বাড়ির পরিবেশটা সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি রকমের সাত্বিক ছিল। আমার মা বাজপাখীর মত তীক্ষ্ণ সতর্কতার সংগে আমাদের দুই বোনকে যতরকম দুষ্ট প্রভাব থেকে আগলে রাখতেন। সিনেমা যেতাম কালে ভদ্রে। মার সঙ্গে দুই বোন যেতাম। বাবা অতক্ষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে সিনেমার পর্দায় চোখ আটকে বসে থাকা পছন্দ করতেন না। ডাক্তার মানুষ। সেই সঙ্গে সমাজসেবীও। সকাল সন্ধ্যা লোকজন নিয়ে কারবার। কথা বলতে না পেলে দম বন্ধ হয়ে আসতো তাঁর।

কেবলমাত্র "ভাল ভাল" বই-ই দেখানো হত আমাদের। বাবা লোকজনের মুখে শুনে আসতেন অমুক বইটা শিক্ষামূলক অথবা দেশাত্মবোধক।

মাকে বলতেন, "মেয়েদের নিয়ে ঘুরে এসো। ওদের দেখা দরকার।"

ও হরি! সব বইয়েই কোথাও না কোথাও আপত্তিজনক কিছু মা'র নজরে পড়বেই।

আর অমনি মা বলে উঠবে, "চোখ বন্ধ কর। আমি না বলা অবধি চোখ খুলবে না।"

অন্ধকারে মা'র এই মিলিটারি কমাণ্ড সমানে চলতে থাকতো, খানিক বাদে বাদেই।

"হ্যাঁ, এবার চোখ খুলতে পারো।"

"না, না, এখন খুলো না।"

আশেপাশের দর্শকদের প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করে আমার ভারি অস্বস্তি হত, যদিও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেনি কোনদিন। আমার দিদি দারুণ বাধ্য মেয়ে ছিল। আমি কিন্তু মা "চোখ বন্ধ কর" বললেই তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসতাম। আকণ্ঠ গিলতাম তথাকথিত আপত্তিজনক অংশটুকু। আপত্তিজনক মানে আর কি, নায়ক হয়তো নায়িকার দিকে জুল জুল করে তাকিয়েছে; কিংবা রাজা দেশের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হতে যাবার আগে আলগোছে রাণীর কপোলে একটু আঙুল ঠেকিয়েছে। আমার সিনেমা দেখতে মোটেই ভাল লাগতো না। হলে বসে অন্য নানান কথা ভাবতাম। মা'র বারণ করা অংশটুকুই দেখা হত বেশীর ভাগ সিনেমায়।

আমার দিদি মা'র নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতো। শরৎচন্দ্রের বই পড়া মানা বলে রামের সুমতি আর বিন্দুর ছেলে পড়েনি, স্কুলের পাঠ্য হওয়া সত্ত্বেও। শেষে আমাদের বাংলার দিদিমণি আমাদের বাড়িতে এসে মা'র কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি চেয়ে নিলেন দিদির হয়ে।

একবার দুর্গাপুজোর কাল্চারাল্ প্রোগ্রামে একটা নাচ ছিল। রোজ এক প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়ে দিদি অন্য ক'জন মেয়ের সঙ্গে নাচ প্র্যাকটিস করতো। একদিন কি মতিচ্ছন্ন ধরলো দিদির, বাড়িতে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচতে আরম্ভ করলো গুন্ গুন্ করে গানের কলি গেয়ে। মা রান্না করছিলেন।

রান্না ফেলে ছুটে এলেন, "এ কি গান করছো?"

দিদি কৃতার্থ মুখে নাচ গান দুটোই আর এক দফা করলো।

মা বললেন, "আর কক্ষণো এই গান করবে না। পুজোয় নেচে কাজ নেই তোমার।"

এখনও সেই গানটা আমার মনে আছে, "চাঁদ ও চকোরে অধরে অধরে প্রেম সুধা পান করে।"

আমাদের বাড়ি প্রতি বছর সরস্বতী পুজো হত, দেবী সরস্বতীর ছবির সামনে বই-খাতা দোয়াত-কলম সাজিয়ে। আমার মা মন্তর বলতেন, "---- কণ্ঠ শোভিত মুক্তা হারে ----।" এই সেদিন কারো বাড়ি সরস্বতী পুজোয় গিয়ে শুনলাম বলছে, "---- কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে ----।"

"ওটা কণ্ঠশোভিত মুক্তাহারে হবে বোধ হয়।" গৃহকর্ত্রীকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করলাম।

উনি বললেন, "না তো! কুচযুগ শোভিতই তো লেখা আছে পাঁচালিতে।"

পুজো সারা হলে চটি বইখানা আমার হাতে তুলে দিলেন। পরিচিত প্রামাণ্য পাঁচালি। পূজা পদ্ধতি, সরস্বতীর স্তোত্র, প্রণাম মন্ত্র, সব কিছু হুবহু আমার মা যেভাবে করতেন। শুধু পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রের শেষদিকে একটুখানি তফাৎ - কণ্ঠশোভিত'র বদলে কুচযুগশোভিত। আমাদের দুই বোনকে সবরকম অবাঞ্ছনীয় প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্যে আমার মা পুজোর মন্ত্রকেও পরিশোধিত করে নিতেন।

তবে বাড়ির মধ্যেই শুধু এত কড়াক্কড়ি ছিল আমাদের। বাইরে গেলে চোখ কান খোলা রাখতাম। নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করতাম অবিরত - ভাল, মন্দ,

যেমন তেমন। দু'এক বছর অন্তর লম্বা ছুটিতে আমরা "লছিমপুর" (কাল্পনিক নাম ব্যবহার করলাম) যেতাম। সেখানে মামা কাকা জ্যেঠা পিসি, আবার তাদের আত্মীয় কুটুম্ব, সবাই মিলে এলাহি ব্যাপার চলতো কয়েক সপ্তাহ ধরে। প্রায় আধ-ডজন দিদি ও গোটা আষ্টেক দাদা ছিল বাড়িতে। ওখানে আমাদের গতিবিধির উপর কোন বাধানিষেধ ছিল না। লছিমপুর মার শ্বশুর বাড়ি (মামা'রা কাকীমা জ্যেঠিমাদের ভায়েরা সব, ছুটি পালন করতে লছিমপুরে আসতো যারা) ; তায় আবার ছুটিতে এসেছে, বরাবরের বাসিন্দা নয়। যে কারণেই হোক, লছিমপুরে গেলে মা একেবারে অন্য মানুষ। সর্বদা ঘোমটা দিয়ে (খোঁপা ঢাকা ঘোমটা, অবগুণ্ঠন নয়) থাকতো, কথা বলতো কম আর প্রতিবারই অন্তত অর্ধেকটা সময় জ্বর বাধিয়ে আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছোট ঘরখানায় শুয়ে থাকতো সাবু-বার্লি খেয়ে। একটা কথা সেই অল্প বয়সেও মনে হয়েছে আমার যে লছিমপুরে এলেই শুধু মা'র এত লম্বা জ্বর হয় অন্য কোথাও হয় না। ওখানকার পরিবেশে মা'র মত কড়া অভিভাবকের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হত। তবু কর্তব্যের খাতিরে - শ্বশুর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ ত্যাগ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয় - লছিমপুরে যেতে আপত্তি করতো না। হয়তো লছিমপুর বাসের সুদীর্ঘ সময়ের অর্ধেকটা রুগী সেজে নিরিবিলি ঘরে কাটানোর যোগসাজশে আমার বাবার হাত ছিল। বাবা ডাক্তার। বাবাই রোগ নির্ণয় করে বিশ্রাম নিতে বলতেন।

লছিমপুরে আমার কিন্তু দারুণ লাগতো। একেবারে অন্য একটা জগৎ। ওখানকার দিদিদের মধ্যে আমি খুব পপুলার ছিলাম। যে যখন পারতো আমার হাত ধরে - আমাকে এক হাতে ঝুলিয়ে - বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তো। এর মধ্যে দু'জনের বয়ফ্রেণ্ড ছিল - অল্প বয়সী দু'টি ছেলে, সবে গোঁফ বেরিয়েছে। বয়ফ্রেণ্ডের বাড়িতেও বোধহয় কড়াক্কড়ি ছিল। কষ্টেসৃষ্টে নিরালা জায়গা খুঁজে চুমু খেতো ওরা। অনেক সময় আমাকে হাতে ঝুলিয়েই।

দিদিরা কেউ আমার দিদিকে সঙ্গে নিতে চাইতো না। আমি নিশ্চিত আমার বদলে দিদিকে নিয়ে গেলে ও তাদের চুমু খাওয়ার কথা বাড়ি এসে তো বলতোই, সম্ভবত অকুস্থলেই চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে ফেলতো। বেচারি দিদি! লছিমপুরের সেই খোলামেলা আমুদে পরিবেশেও দিদি প্রতি পদক্ষেপে আমাদের আরার বাড়িতে প্রযোজ্য কড়া অনুশাসন মেনে চলতো। মাঝে মাঝে বিশেষ কোন ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে মার কাছে নির্দেশ চাইতে গিয়ে বকুনি

খেয়ে ফিরে আসতো। দুখী দুখী মুখ করে এক কোনে বসে থাকতো।

অথচ আমার দিদিকে কেউ কখনো ’নাইভ’ আখ্যা দেয়নি, আমাকে যেমন দিয়েছে। তবে আমার এখন আর সেজন্যে কোনও ক্ষোভ নেই। কারণ এখন আমি জানি যে লোকের কাছে ’নাইভ’ মনে হওয়াটা (এটা কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ’নাইভ’ হওয়া নয়) কিছুই বোঝায় না। অনেক বুদ্ধিমান লোককে - ঝানু লোককেও - বাইরে থেকে দেখে মনে হয় নেহাৎ গোবেচারা ভালমানুষটি। ভাজামাছ উল্টে খেতে জানে না। বস্তুত এই মূলধনটি খাটিয়েই জীবনভোর করে খেয়েছে অনেকে।

এবার লছিমপুরের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। বাড়িতে আমার মার তত্বাবধানে সর্বতোভাবে নির্দোষ নিষ্কলুষ পরিবেশে বড় হয়েও যে বহির্জগৎ সম্বন্ধে খানিকটা ওয়াকিবহাল হতে পেরেছি (অন্যবিধ বহিরাবরণ সত্বেও - আগেই বলেছি বাইরে থেকে দেখে অন্যদের কি মনে হয় তা একেবারেই অবান্তর) তার অনেকখানিই লছিমপুরে নিয়মিত ছুটি পালনের কৃতিত্ব।

মুক্তাপিসিকে লছিমপুরেই দেখেছিলাম। মুক্তাপিসির তখন সাঁইত্রিশ- আটত্রিশ বছর বয়স। আমার পনেরো। মুক্তাপিসিই আমার প্রথম আরাধ্যা, হিরোইন। কি সুন্দর দেখতে! অতি সাধারণ সাজপোষাকেও স্মার্ট ফিটফাট লাগতো। পিসির বিয়ে হয়নি কেন তা নিয়ে কথা বলতো লোকে। পরে আমার মনেও প্রশ্ন জেগেছিল। ওখানকার এক দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। এই দিদিটিও আমার খুব ছোটবেলায় আমায় সঙ্গে নিয়ে বয়ফ্রেণ্ড সন্দর্শনে গিয়েছিল। পরের বছরও ছুটিতে ও আমাকেই সঙ্গী করেছিল যদিও তখন আর আগের বয়ফ্রেণ্ড নেই। অন্য আরেকজন। আমি যে দিদিটির গুপ্ত কথা বাইরে ফাঁস করে দিইনি এ কারণে সেই দিদি - ধরা যাক তার নাম সরসী - আমাকে পরবর্তীকালে বেশ খাতির করতো। এরপর সরসীদির বিয়ে হয়ে গেল। আমি তখন কলেজে পড়ি। আমার সঙ্গে হৃদ্যতা রয়েই গেল তার। জামাইবাবুটিও ভারী আমুদে, সুপুরুষ। ততদিনে আমার বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে। ছোটখাটো ব্যাপারগুলো মনেও রাখিনি আর। অন্তত সেগুলো যে মনে রাখার মত ব্যাপার নয় সেটুকু বুঝতে শিখেছি।

মুক্তাপিসির সঙ্গে খুনসুটি করছে সবাই। কে যেন মুক্তাপিসির বিয়ের কথা তুললো। এত বয়স অবধি বিয়ে করেনি কেন?

আরেকজন বললো, "ওমা, জানিস না বুঝি? বচিত্তর সিং ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে মুক্তা।"

"বচিত্তর সিং আবার কে? কোনদিন নাম শুনিনি তো!"

মুক্তাপিসি একগাল হেসে বললো, "শুনিস্নি বুঝি? বচিত্তর সিং হল একটা ভেঁসার নাম। পাকানো শিং-ওলা ইয়া-ব্বড় কালো একটা মোষ।"

বুঝলাম ঠাট্টা করছে কিন্তু ঠাট্টার তাৎপর্য বুঝলাম না। কালো মোষ, মোষ তো কালোই হবে। তার শিং ও থাকবে। তাই বলে মোষের নাম বচিত্তর সিং হতে যাবে কেন? সরসীদিকে আড়ালে শুধোলাম একদিন।

সরসীদি হেসে বললো, "সে এক লম্বা কাহিনী। মুক্তাপিসিকে জিজ্ঞেস করলে সে-ই বলবে তোকে।" বললাম, "না, তুমি বলো বচিত্তর সিং'এর গল্প। তোমার কাছেই শুনবো।"

সত্যিই বিচিত্র সে কাহিনী। সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম।

মুক্তাপিসিরা নাকি অবিভক্ত পাঞ্জাবের বাসিন্দা ছিল। পিসির জন্মেরও আগে তার ঠাকুর্দা চাকরি নিয়ে ওই তল্লাটে যায়। তার আগে কোন এক বিলিতি কোম্পানিতে কাজ করতেন তিনি। কলকাতায়। শরীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বারোমাসই ভুগতেন কোন না কোন ব্যারামে। চাকরি রাখা দায়। তারপর এক পাঞ্জাবী সহকর্মীর পরামর্শে পাঞ্জাবে পাড়ি দিলেন। সেই সহকর্মীই চাকরি জোগাড় করে দিলো। এক জমিদার বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ। মুক্তাপিসির ঠাকুর্দার নাম মণিভূষণ রায়। স্ত্রী ও বালক পুত্র ফণীভূষণকে নিয়ে জমিদারীতে এসে উঠলেন। জমিদার মশাই ভাল মাইনে দিলেন, গ্রামে বেশ বড় খোলামেলা বাড়ি দিলেন। পাঞ্জাবে এসে সত্যিই হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন মণিভূষণ। কৃতজ্ঞচিত্তে শিক্ষকতার কাজে ঢেলে দিলেন নিজেকে। জমিদার উদারচেতা মানুষ। মণিভূষণের তদারকে পড়াশুনা করে তাঁর নিজের পরিবারের ছেলেরা এত দ্রুত উন্নতি করছে দেখে অন্যদেরও পরামর্শ দিলেন মণিভূষণের কাছে তাদের ছেলেদের পড়তে পাঠাতে। মণিভূষণের আয় হুড় হুড় করে বেড়ে গেল। ফণীভূষণ পাঞ্জাবেই পড়াশুনা করলো। পড়াশুনা শেষ করে ফণীভূষণও শিক্ষকতায় লেগে গেল। মণিভূষণের কলকাতার আত্মীয়স্বজনদের চেষ্টায় একটি সুশ্রী সুলক্ষণা পাত্রী জোগাড় হল এবং শুভলগ্নে ফণীভূষণের বিবাহ সমাধা হল। যথাসময়ে একটি কন্যা জন্ম নিলো, যিনি আমাদের এই মুক্তাপিসি।

বাবা-ছেলে দুজনেরই শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। দূর এলাকা

থেকে ছাত্র আসতে লাগলো। যে সব ছেলেরা অন্য তল্লাটে স্কুল কলেজে পড়তো, ভাল রেজাল্টের লোভে তাদেরও ছুটির সময় এঁদের কাছে পাঠাতে লাগলো অভিভাবকেরা। দূর গ্রামে যাদের বাড়ি তারা শিক্ষকের বাড়িতেই বাস করতো। মাঝে মধ্যে বাড়ি যেতো। তাতে শিক্ষক পরিবারের অসুবিধা হত না। সুবিশাল প্রাঙ্গণ। মুখ্য বসত বাড়ি ছাড়াও গোটা তিনেক ছোট ছোট আউট হাউস। মাঠ - পুকুর - গোয়ালঘর। দূর গ্রামের অভিভাবকেরা গরু মোষ ভেট পাঠাতো কেউ কেউ। ও তল্লাটে গরু বিরল। মোষই বেশী। একবার ডাকসাইটে একটা মোষ ভেট দিয়েছিল এক ছাত্রের অভিভাবক। ছেলেটির নাম বচিত্তর সিং। কালো কুচকুচে রং, পেল্লায় লম্বাচওড়া গড়ন। ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফদাড়ি। মাথায় রঙিন পাগড়ি। সব মিলিয়ে দারুণ জমকালো চেহারা।

মুক্তার বয়স তখন নয় কি দশ। বয়স আন্দাজে লম্বা, বাড়ন্ত গড়ন, অসামান্য রূপ লাবণ্য। ছোটবেলা থেকে ডানপিটে স্বভাবের মেয়ে। কখনো পুকুরে সাঁতার কাটছে, কখনো মোষের পিঠে চড়ে বসছে, কখনো বা পেয়ারা গাছে উঠে পড়ছে মেয়ে। অবশ্য সমস্ত কার্যকলাপ অন্দরমহল এলাকাতেই চলতো। খিড়কি-দুয়োরের লাগোয়া পুকুর, গাছ-গাছালি, বাথান। সবই জেনানাদের নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে। গৃহস্থের বেতনভুক পরিচারক ছাড়া বাইরের কোন পুরুষের পাদস্পর্শ ঘটেনা সেখানে। অন্যদের আনাগোনা বাহির-বাড়ির বৈঠকখানা ও তিনটি আউট হাউসেই সীমাবদ্ধ।

এর মধ্যে দুম করে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। মুক্তার স্তম্ভিত অভিভাবকরা শুনলেন বচিত্তর সিং নাকি মুক্তার পাণিপ্রার্থী। না, কোন রকম অসংযত আচরণ করেনি বচিত্তর সিং। নিজের মনোবাসনা বাড়ি ফিরে নিজের বাবা-মা'কে জানিয়েছে। তাঁরাই যথারীতি বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। মুক্তার বাবা-মা, ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা'র তো প্রস্তাব শুনে চক্ষুস্থির! তাঁদের দুগ্ধপোষ্য কন্যা ও নাতনীকে বিয়ে করবে ওই কালাপাহাড়, ওই পেল্লায় দাড়ি-গোঁফ-পাগড়িওলা লোকটা!

মেয়ের বয়স দশও হয়নি শুনে পাত্রের অভিভাবকরা হকচকিয়ে গেলেন। ভুল বুঝতে পেরে মার্জনা চাইলেন। বচিত্তর সিং ভেবেছিল মুক্তা ত্রয়োদশী কন্যা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় পূর্ণযৌবনা। বাহির বাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে ঝলকমাত্র দেখেছে তার। বয়সটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। সে-ও লজ্জা পেলো এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ের প্রস্তাব করায়। কিন্তু

মণিভূষণ গললেন না। বচিত্তর সিং ও বচিত্তর সিং'এর আনা মোষটিকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিলেন। এরপর মুক্তার বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বাড়িতে পর্দানশীন হয়ে থাকার ব্যবস্থা হল। জানলা দরজায় চিক টাঙানো হল। চিকের উপর পর্দা। সরসীদি এই অবধি বলে কাহিনীতে ইতি টেনে দিলো।

আমার মাথায় ক্রমাগত বচিত্তর সিং'এর কথা ঘুরতে লাগলো। দু'দিন পর আবার পাকড়ালাম সরসীদিকে। "তারপর কি হল সরসীদি? বচিত্তর সিং আর কখনো মুক্তাপিসিদের বাড়ি আসেনি?"

"একবার এসেছিল শুধু। সঙ্গে একটা মোষের বাচ্চা নিয়ে। মোষটা যখন নিয়ে গেছিল, তার পেটে বাচ্চা ছিল। বাচ্চাটাকে ফেরৎ দিয়ে গেল। মণিভূষণ বচিত্তর সিং'কে খাতির যত্ন করেছিলেন, বাইরে থেকে আসা সব অতিথিদের যেমন করেন। যাওয়ার সময় আঙিনার বাইরে গিয়ে বচিত্তর সিং নাকি শার্টের খুঁটে চোখ মুছছিল।

মণিভূষণ বললেন, মোষের বাচ্চাটার উপর নিশ্চয় মায়া পড়ে গেছিল। তাই তাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল বচিত্তর সিং'এর। মণিভূষণের ইচ্ছে ছিল না মোষের বাচ্চাটাকে এভাবে নেওয়ার কিন্তু
বচিত্তরের বাবা জমিদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রেখেছিল। জমিদারের নির্দেশেই নিতে হল মোষ ছানাটাকে।"

"কিন্তু মুক্তাপিসি বিয়ে করলো না কেন?"

"বিয়ে করবে কি! মুক্তাপিসির যখন বিয়ের বয়স তখনই তো দেশ ভাগ হয়ে গেল। মণিভূষণ ও তাঁর স্ত্রী তখন গত হয়েছেন। সবকিছু খুইয়ে কোনমতে প্রাণটা হাতে নিয়ে মুক্তাপিসি আর তার বাবা-মা কলকাতা পৌঁছলো। অত বছর কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। সেখানে সামান্য যা পুঁজিপাতি ছিল তারও হদিস মিললো না আর। মুক্তাপিসি লেখাপড়ায় বরাবর ভাল ছিল। বি এ পাস করেছিল। এম এ টা আর পড়া হল না। কোনমতে একটা চাকরি জোগাড় করে বাবা মা আর নিজের অন্নসংস্থানে লাগলো। এখন অবশ্য চাকরিতে অনেক উন্নতি করেছে। তবে বিয়ের কথা ভাবে না আর। বাবা-মা'কে ভালভাবে রেখেছে। একটা স্বাধীন সম্মানের জীবন পেয়েছে। এটুকুই বা কম কিসে?"